ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607011

প্রাচীন হিন্দু বিবাহে নারীর অবস্থান: একটি ঐতিহাসিক ও আইনি বিশ্লেষণ

গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল*

Abstract: This article presents a historical and legal analysis of women in ancient Hindu marital institutions. It traces developments from the Vedic corpus through the Sūtra, Smṛti and Purāṇic periods chronologically and connects them to the modern period. The study relies on close readings of canonical texts, commentaries and relevant archaeological evidence too. It demonstrates that early forms of female ritual agency and marital choice were progressively curtailed. Doctrinal norms and ritual prescriptions legitimised practices such as *kanyādāna* and child marriage across time. Legal formations concerning *strīdhan*, patrimonial inheritance and marital indissolubility entrenched economic dependency and social marginalisation. The article locates these practices within broader patriarchal frameworks and textual authority over time historically. It argues that these historical formations have left durable traces in contemporary Hindu personal law. Consequently, gendered disadvantages persist, requiring doctrinal reappraisal and legislative intervention to promote substantive gender justice. The study offers specific pathways for reform grounded in textual critique and comparative law analysis.

মূখ্যশব্দ: হিন্দু বিবাহ; কন্যাদান; পতিব্রতা; স্ত্রীধন; পিতৃতন্ত্র; নারী অধিকার।

১. ভূমিকা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও সমাজকাঠামো বিনির্মাণে বিবাহ কেবল জৈবিক তাড়না বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের নামান্তর নয়; বরং এটি একটি সুপ্রাচীন, সর্বজনীন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Westermarck, 1921, p. 26)। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বীক্ষণে বিবাহ হলো এমন এক সাংস্কৃতিক ও আইনি বন্দোবস্ত, যা নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ককে সামাজিক বৈধতা দান করে এবং বংশপরম্পরা রক্ষা ও উত্তরাধিকার নির্ণয়ের পথ সুগম করে (Kapadia, 1966, p. 140)। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিশেষত সনাতন হিন্দু

* সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজব্যবস্থায়, বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি নিছক কোনো দেওয়ানি চুক্তি (Civil Contract) বা রোমান্টিক সখ্যতা নয়; বরং এটি একটি পবিত্র ধর্মীয় সংস্কার বা 'sacrament' হিসেবে স্বীকৃত (Diwan, 2018, p. 55)। প্রাচীন আর্য ঋষিদের মানসপটে বিবাহ ছিল গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের সিংহদ্বার, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দায় এবং পিতৃঋণ পরিশোধের সুযোগ লাভ করেন (Kane, 1941, p. 428)।

তবে, ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা একই রূপে বা আদর্শে বিরাজ করেনি। বৈদিক যুগের প্রারম্ভিক সরলতা থেকে শুরু করে পরবর্তী স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগের জটিল অনুশাসন পর্যন্ত হিন্দু বিবাহ প্রথা বহুবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে (Altekar, 1959, p. 69)। এই বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং একইসাথে বিতর্কিত দিকটি হলো বিবাহ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও আইনি কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণ করলে নারীর অবস্থানে এক চরম বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। একদিকে ঋগ্বেদ ও উপনিষদের মতো শ্রুতিগুলোতে নারীকে 'অর্ধাঙ্গিনী', 'গৃহলক্ষ্মী' বা 'সম্রাজ্ঞী' হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে, যেখানে যজ্ঞ ও আধ্যাত্মিক সাধনায় পতির পাশাপাশি পত্নীর অবস্থান ছিল অপরিহার্য (Jamison & Brereton, 2014, p. 1515)। অন্যদিকে, কালক্রমে রচিত ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে, বিশেষত মনুসংহিতায়, নারীর সেই স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে খর্ব করে তাঁকে পুরুষের চিরস্থায়ী অধীন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। মনুর বিখ্যাত উক্তি– 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে; রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' (মনুসংহিতা ৯.৩)-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো যে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র নারীর রক্ষক বলে বিবেচিত; ফলে নারী কোনো অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী নয়। এই উক্তিটি নারীর আজীবন পরাধীনতার একটি আইনি ও আদর্শিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে (Olivelle, 2005, p. 192)।

এই গবেষণার মূল সমস্যাটি বা 'Research Problem' এখানেই নিহিত। তাত্ত্বিক ও দার্শনিক স্তরে হিন্দু ধর্মে নারীকে 'শক্তিরূপেন/মাতৃরূপেন' অর্থাৎ দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হলেও, ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের আইনি কাঠামোতে তাঁকে কেন এবং কীভাবে পুরুষের সেবাদাসীতে পর্যবসিত করা হলো? কেন বৈদিক যুগের বিদুষী নারী, যিনি স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে পতি নির্বাচনের অধিকার পেতেন, তিনি পরবর্তীকালে 'পণ্যদ্রব্যে'র ন্যায় 'কন্যাদান' প্রথার অনুষঙ্গ হয়ে উঠলেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের দিকে (Sharma, 1983, p. 58)। বৈদিক-উত্তর যুগে ক্রমান্বয়ে বর্ণপ্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি এবং পিতৃতান্ত্রিক সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ কীভাবে নারীর যৌনতা ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করেছিল, তা এই গবেষণার অন্যতম অন্বেষণ (Chakravarti, 1993, p. 580)।

প্রস্তাবিত এই গবেষণাপত্রের কালপর্ব বা পরিধি মূলত বৈদিক যুগ (আনুমানিক ১৫০০–১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) থেকে শুরু করে মহাকাব্য, পুরাণ ও ধ্রুপদী স্মৃতিশাস্ত্রের (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ– ২০০ খ্রিস্টাব্দ) সময়পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্তে লৌকিক আচার ও দেশাচারভেদে বিবাহরীতির বৈচিত্র্য বিদ্যমান, তবুও এই গবেষণায় প্রধানত 'ব্রাহ্মণ্য হিন্দু বিবাহ' বা উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় বিবাহরীতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নারীদের অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ, এই শাস্ত্রীয় বিধানগুলোই কালক্রমে বিধিবদ্ধ (Codified) হয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজের জন্য আদর্শ বা 'Normative Law' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং আধুনিক হিন্দু আইনের ভিত্তি রচনা করেছে (Menski, 2003, p. 89)।

এই প্রবন্ধে গুণগত বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বেদ, উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, অর্থশাস্ত্র এবং পুরাণসমূহের মূল পাঠ ও ভাষ্যগুলোর ওপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে, এই গবেষণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা প্রয়োজন। পর্যালোচিত ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি-সংহিতাগুলোর বিভিন্ন সংস্করণ, পাঠভেদ এবং সম্পাদনার পার্থক্য বিশ্লেষণে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি, মূল গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় ভাষাগত সূক্ষ্মতা, ব্যাকরণগত ভিন্নতা ও শব্দার্থগত জটিলতাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করাও কঠিন। ফলে, ব্যবহারিক কারণে লেখককে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ এবং ভাষ্যনির্ভর ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা অনুবাদ-নির্ভরতা ও ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, তাত্ত্বিকভাবে আরও গুরুতর সীমাবদ্ধতা হলো– এই প্রাচীন গ্রন্থাবলি প্রায় সর্বাংশেই পুরুষ ঋষি ও শাস্ত্রকারদের দ্বারা রচিত; ফলে নারীর নিজস্ব বয়ান বা 'voice' সেখানে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এসব গ্রন্থে নারীর সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-অসম্মতি প্রভৃতি অভিজ্ঞতা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপস্থাপিত হয়েছে, যা নারীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বহুক্ষেত্রেই সীমিতভাবে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, 'পতিব্রতা' ধর্মের যে মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, তা নারীর স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ছিল, নাকি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা আরোপিত এক ধরনের 'Hegemonic' বা আধিপত্যবাদী আদর্শ, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। তাই এই প্রবন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণা ও মূল্যবোধের বিনির্মাণ বা 'Deconstruction'-এর মাধ্যমে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এই প্রবন্ধটি কেবল একটি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নয়। বরং, প্রাচীন আইনি ও সামাজিক কাঠামো কীভাবে আধুনিক হিন্দু নারীর অধিকার, বিশেষত বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে আজও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তার শেকড় সন্ধানের একটি প্রয়াস। প্রাচীন ভারতে নারীর আইনি অক্ষমতার যে বীজ রোপিত হয়েছিল, তা বর্তমান

বাংলাদেশের হিন্দু পারিবারিক আইনে কতটা প্রাসঙ্গিক বা প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান, সেই আলোচনার সূত্রপাত এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২. বিবাহের তাত্ত্বিক ও সামাজিক ধারণা: পবিত্রতা বনাম আবশ্যকতা

প্রাচীন ভারতীয় সমাজমানসে ও ধ্রুপদী হিন্দু আইনশাস্ত্রে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কেবল নারী ও পুরুষের জৈবিক মিলন বা প্রজননের নিমিত্তে সৃষ্ট কোনো লৌকিক সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি হিন্দু জীবনদর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অধ্যায় (Kane, 1974)। পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' বা সামাজিক চুক্তির ধারণার বিপরীতে হিন্দু শাস্ত্রে বিবাহকে একটি পবিত্র 'সংস্কার' (Sacrament) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার মূলে রয়েছে এক গভীর দার্শনিক প্রত্যয় (Diwan, 2020)। এই প্রত্যয় অনুযায়ী, বিবাহ ইহজাগতিক সুখের চাইতে পারলৌকিক কল্যাণ এবং বংশপরম্পরার শুদ্ধতা রক্ষার এক পবিত্র যজ্ঞবিশেষ (Mulla, 2016)। প্রাচীন ঋষি ও স্মৃতিকারগণের তাত্ত্বিক বয়ানে বিবাহ হলো গৃহস্থাশ্রমের প্রবেশদ্বার, যা ব্যতীত ব্যক্তির, বিশেষত পুরুষের, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং মোক্ষলাভ অসম্ভব। তবে, শাস্ত্রীয় এই পবিত্রতার আড়ালে নারী ও পুরুষের জন্য বিবাহের আবশ্যকতার যে ভিন্নধর্মী মানদণ্ড বা 'দ্বান্দ্বিক অবস্থান' নির্ধারিত হয়েছে, তা এক গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। মূলত, এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতরেই নারীর অধস্তনতার বীজ রোপিত ছিল, যা 'পবিত্রতা'র মোড়কে নারীর স্বাতন্ত্র্যকে পুরুষের পারলৌকিক স্বার্থের অধীনস্থ করেছে (Altekar, 1959)।

ঐতিহাসিকভাবে বিবাহ প্রথার এই তাত্ত্বিক রূপায়ন একদিনে ঘটেনি; আলটেকারের মতে, প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম সমাজে যখন নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ, তখন থেকে একটি সুশৃঙ্খল ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য বিবাহের উদ্ভব অপরিহার্য ছিল (Altekar, 1959)। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত মহর্ষি শ্বেতকেতুর আখ্যানটি এই বিবর্তনের এক চমৎকার সমাজতাত্ত্বিক দলিল হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে (Ganguli, 2003, Adi Parva, Section CXXII)। এই আখ্যান অনুযায়ী, প্রাক-বৈদিক সমাজে নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক ছিল অবাধ ও ইচ্ছাধীন; সেখানে 'স্বামী' বা 'স্ত্রী'র কোনো স্থায়ী ধারণা বা আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না (Meyer, 1930)। শ্বেতকেতুই প্রথম এই অবাধ যৌনাচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে একটি নির্দিষ্ট আইনি ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন (Ganguli, 2003)। তিনি ঘোষণা করেন যে, স্ত্রী যদি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে গমন করেন বা পতি যদি স্বীয় পত্নীকে অবজ্ঞা করেন, তবে তা 'ভ্রূণহত্যা'র সমতুল্য পাপ হিসেবে গণ্য হবে। শ্বেতকেতুর এই বিধান কেবল নৈতিকতার প্রশ্ন ছিল না, বরং এটি ছিল পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ও বংশের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ (Kapadia, 1966)। এর মাধ্যমেই নারীর যৌনতার ওপর

পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার বা 'এক্সক্লুসিভ সেক্সুয়াল রাইট' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিবাহ একটি নিছক প্রথা থেকে পবিত্র 'সংস্কার'-এ উন্নীত হয়, যা সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলার দিকে ধাবিত করে (Altekar, 1959)।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিবাহকে মানুষের পূর্ণতা লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে; শতপথ ব্রাহ্মণে (২.১.১০) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, একজন পুরুষ ততক্ষণ পর্যন্ত 'অসম্পূর্ণ', যতক্ষণ না তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান উৎপাদন করছেন (Eggeling, 1882, Satapatha Brahmana, 2.1.10)। এই তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন হিন্দু সমাজব্যবস্থায় চিরকৌমার্যকে উৎসাহিত করা হয়নি (Kane, 1974)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তো অবিবাহিত ব্যক্তিকে 'অপবিত্র' বা যজ্ঞের অযোগ্য বলেও অভিহিত করা হয়েছে (Keith, 1914, Taittiriya Brahmana, 2.2.2.6)| কিন্তু এই 'পূর্ণতা'র ধারণাটি নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান অর্থ বহন করত না। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, এখানে নারীর অবস্থানটি মূলত 'পরিপূরক' বা Instrumental। অর্থাৎ, পুরুষকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই নারীর সৃষ্টি, এই ধারণাটিই প্রবল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩.১) বলা হয়েছে, স্বামী তাঁর জায়া বা স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে পুত্ররূপে নবজন্ম লাভ করেন (Haug, 1863, Aitareya Brahmana, 33.1)। অর্থাৎ, নারীর জঠর হলো পুরুষের পুনর্জন্ম ও অমরত্ব লাভের ক্ষেত্র বা আধার। এখানে নারীর নিজস্ব মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়ে পুরুষের মোক্ষলাভে সহায়তা করাই তাঁর প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় (Mulla, 2016)। বৈদিক যুগে স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' বলা হতো, যার অর্থ যজ্ঞে তিনি পতির সমান অংশীদার; কিন্তু পরবর্তী স্মৃতির যুগে, বিশেষত মনুসংহিতায়, এই 'সহধর্মিনী'র ধারণাটি পাল্টে গিয়ে নারী কেবল পুরুষের সেবাদাসী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হন (Buhler, 1886)। বিষ্ণু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণেও গৃহস্থ ধর্ম পালনের জন্য এবং দান গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য পুরুষের বিবাহকে আবশ্যিক বলা হয়েছে, যেখানে নারী হলেন সেই ধর্ম পালনের অপরিহার্য 'উপকরণ' মাত্র (Wilson, 1840)।

হিন্দু চতুরাশ্রম প্রথায় পুরুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চার ভাগে ভাগ করা হলেও, নারীর জন্য বিবাহই হলো একমাত্র 'সংস্কার' এবং কার্যত একমাত্র 'আশ্রম' (Altekar, 1959)। মনুসংহিতায় (২.৬৭) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানই হলো বৈদিক 'উপনয়ন' সংস্কারের সমতুল্য (Buhler, 1886, Manusmriti, 2.67)। অর্থাৎ, পুরুষের যেমন শিক্ষার শুরুতে উপনয়ন হয়, নারীর জীবনে বিবাহই সেই শিক্ষার বা দীক্ষার শুরু। পতিসেবাই হলো তাঁর গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্মই হলো তাঁর অগ্নিহোত্র যজ্ঞ (Buhler, 1886)। এই বিধানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর; এর মাধ্যমে নারীকে বেদপাঠ ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত করা হলো এবং তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে বিবাহের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হলো। পুরুষের জন্য বিবাহ একটি

'অপশন' বা জীবনের একটি পর্যায় হতে পারে; তিনি চাইলে চিরকুমার বা সন্ন্যাসী হতে পারেন, কিন্তু নারীর জন্য বিবাহ হলো বাধ্যতামূলক নিয়তি (Kapadia, 1966)। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে ন্যস্ত করার জন্যই বিবাহকে তাঁর জন্য 'একমাত্র ধর্ম' হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে (Doniger, 1991)। প্রাচীন সাহিত্যে ও পুরাণে দেখা যায়, নারীরা উপযুক্ত পতি লাভের জন্য কঠোর ব্রত, উপবাস ও তপস্যা করছেন; কারণ, অবিবাহিত নারী সমাজে কেবল অপাঙক্তেয়ই ছিলেন না, বরং তাকে অশুভ বা অমঙ্গলজনক মনে করা হতো (Altekar, 1959)। ঋগ্বেদে 'ঘোষা'র মতো নারীদের উদাহরণ থাকলেও, পরবর্তীকালে 'কুমারী' থাকার কোনো সুযোগ নারীর ছিল না; বিবাহই ছিল তাঁর সামাজিক পরিচিতি ও অস্তিত্বের একমাত্র বৈধতা (Griffith, 1896)।

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল 'পুত্রসন্তান' লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যা নারীর সামাজিক অবস্থানকে আরও জটিল করে তুলেছিল (Kane, 1974)। 'পুত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হলো, যিনি পিতাকে 'পুৎ' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ করেন (Buhler, 1886, Manusmriti, 9.138)। বৈদিক আর্যদের কাছে পুত্রসন্তান কেবল বংশের প্রদীপ ছিল না, বরং সে ছিল পরকালে পিতার জলদান ও পিণ্ডদানের একমাত্র অধিকারী (Mulla, 2016)। ঋগ্বেদে নবদম্পতির জন্য আশীর্বাদ করা হয়েছে, ইমাং ত্বম্ ইন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কুরু। দশাস্যাং পুত্রাণাং দেহি, পতিম্ একাদশং কৃধি।। (হে ইন্দ্র, তুমি এই নববধূকে সুপুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী করে দাও। তাকে দশ পুত্র দান কর এবং তাঁর স্বামীকে একাদশ ব্যক্তি করে দাও) (Griffith, 1896, Rigveda, 10.85.45)। লক্ষণীয় যে, এখানে দশটি পুত্রসন্তান লাভের প্রার্থনা করা হয়েছে, কিন্তু কন্যার উল্লেখ নেই (Altekar, 1959)। এই পুত্রসন্তান লাভের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নারীর ওপর বিবাহের চাপকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল; নারীকে দেখা হতো 'ক্ষেত্র' বা জমি হিসেবে এবং পুরুষকে 'বীজ' বা বীজের মালিক হিসেবে (Doniger, 1991)। মনুসংহিতার (৯.৩৩) এই 'ক্ষেত্র ও বীজ' (Field and Seed) রূপকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জমির মালিকানা যার, ফসলও তার– এই নীতির ভিত্তিতেই সন্তান উৎপাদনের ওপর পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Kane, 1974)। নারীর মাতৃত্বকে মহিমান্বিত করা হলেও, তা ছিল মূলত পুত্রপ্রসবের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল; যে নারী পুত্রসন্তান জন্ম দিতে অক্ষম, তাকে 'বন্ধ্যা' বা 'অভাগিনী' হিসেবে সামাজিকভাবে হেয় করা হতো এবং সেক্ষেত্রে পুরুষের জন্য বহুবিবাহ বা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছিল (Diwan, 2020)।

ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে পিতৃঋণ বা পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করার জন্য বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনকে 'মহাযজ্ঞ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে জরৎকারু মুনির উপাখ্যানটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক (Ganguli, 2003, Adi Parva, Section XIII)। সেখানে দেখা যায়,

জরৎকারু আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন তাঁর পিতৃপুরুষেরা সন্তানহীনতার কারণে অধঃপাতে যাচ্ছেন, তখন তিনি কেবল বংশরক্ষার জন্য বিবাহ করতে বাধ্য হন। এই আখ্যানটি প্রমাণ করে যে, বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, বরং একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়বদ্ধতা। আর এই দায়বদ্ধতা পালনের গুরুভারটি চাপানো হয়েছিল নারীর ওপর, অথচ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল পুরুষের হাতে (Kapadia, 1966)।

৩. বিবাহপূর্ব অবস্থান: নির্বাচন, সম্মতি ও যোগ্যতার রাজনীতি

হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ও নারীকেন্দ্রিক সমাজতত্ত্ব অনুধাবন করতে হলে কেবল বিবাহ-পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, বরং বিবাহপূর্ব অবস্থায় নারীর অবস্থান, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সম্মতির প্রশ্নগুলোও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে (Altekar, 1956, p. 29)। প্রাচীন ভারতের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে একজন নারীর বিবাহপূর্ব জীবন ছিল মূলত তাকে 'উপযুক্ত পাত্রী' বা 'আদর্শ ভার্যা' হিসেবে গড়ে তোলার এক দীর্ঘ ও জটিল প্রস্তুতিকাল। বৈদিক যুগের স্বাধীনচেতা ও আত্মসচেতন নারী সত্তা থেকে স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগের 'দানযোগ্য' বিষয়ে রূপান্তরের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, তার সুস্পষ্ট ও বেদনাদায়ক প্রতিফলন ঘটে বিবাহপূর্ব আইন ও আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সরলরৈখিক ছিল না, বরং তা ছিল ধর্ম, সমাজ ও পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির এক জটিল মিথস্ক্রিয়া– যেখানে নারীর বয়স, পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা, শারীরিক যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নিষিদ্ধ সম্পর্কের আইনি বেড়াজাল– এই চারটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে নারীর প্রাক-বৈবাহিক অবস্থানকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো (Chakravarti, 1993)।

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ প্রথায় সবচেয়ে নাটকীয়, বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনটি লক্ষ করা যায় কনের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে। ঋগ্বেদীয় সমাজ ও পরবর্তী স্মৃতির যুগের মধ্যে এ বিষয়ে এক বিরাট ব্যবধান বা 'প্যারাডাইম শিফট' পরিলক্ষিত হয়, যা কার্যত নারীকে এক পূর্ণাঙ্গ মানবিক সত্তা থেকে নিছক যৌন বস্তুতে পর্যবসিত করে (Upadhyay, 1974, p. 187)। ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের (Post-puberty Marriage) সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য প্রমাণ মেলে। বৈদিক পরিভাষায় বিবাহকে বলা হয়েছে 'উদ্বাহ', যার শাব্দিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো কনেকে পিতার গৃহ থেকে পতিগৃহে বহন করে নিয়ে যাওয়া। এই শব্দটি নিজেই ইঙ্গিত দেয় যে, কনে তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে দাম্পত্য জীবন শুরুর জন্য এবং একটি নতুন পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন (Kane, 1941, Vol. II, p. 439)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ২৭ নম্বর সূক্তের ১২ নম্বর মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী কনে নিজেই স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে বা 'সমনা' উৎসবে অংশগ্রহণ করে জনসমক্ষে নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করছেন (Rigveda, 10.27.12)। আলটেকার এবং উপাধ্যায়ের মতো প্রখ্যাত গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, বৈদিক যুগে কনের গড় বয়স ছিল

ষোলো থেকে আঠারো বছর (Altekar, 1956, p. 52)। এ সময় পূর্ণযৌবনা নারীরাই কেবল বিবাহের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন, যাঁরা দাম্পত্যের গভীরতা ও জটিলতা অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন। বৈদিক বিবাহে 'বিশ্বাবসু' গন্ধর্বের আরাধনা এবং 'চতুর্থীকর্ম' বা বিবাহের চতুর্থ দিনে সহবাসের যে বিধান ছিল, তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কনে ছিলেন যৌনজীবনের জন্য শারীরিকভাবে পরিপক্ব। বিশ্বাবসুকে উদ্দেশ্য করে যখন বলা হতো, "অন্য কোনো কুমারীর সন্ধান করো, এই কনে এখন তাঁর স্বামীর জন্য প্রস্তুত" (Rigveda, 10.85.22), তখন তা একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল; একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রোচ্চারণ ছিল অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক।

তবে সূত্র ও মহাকাব্যের যুগ থেকে এই চিত্র দ্রুত ও নেতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ১০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সূত্রকারগণ, বিশেষত গৌতম ও বশিষ্ঠ, বাল্যবিবাহের পক্ষে মত দিতে শুরু করেন (Kane, 1941, Vol. II, p. 443)। এই পরিবর্তনের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল নারীর সতীত্ব বা 'ভার্জিনিটি' রক্ষার চরম পিতৃতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় 'বিশুদ্ধতা'র ধারণা। মনুসংহিতায় এসে এই ধারণা আইনি বৈধতা ও কঠোরতা লাভ করে। মনু বিধান দেন যে, ৩০ বছর বয়সী পুরুষ ১২ বছর বয়সী কন্যাকে এবং ২৪ বছর বয়সী পুরুষ ৮ বছর বয়সী কন্যাকে বিবাহ করবেন (Manu Smriti, 9.94)। এই বিধানের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে এক বিশাল অসমতা তৈরি করা হলো, যা দাম্পত্য জীবনে নারীর অবদমনকে সহজতর করে তুলল। স্মৃতিশাস্ত্রে 'ঋতুমতী' হওয়ার পূর্বে কন্যাদানকে 'গৌরীদান' বা মহা পূণ্যকর্ম হিসেবে মহিমান্বিত করা হলো। পরাশর সংহিতা ও যম সংহিতায় আরও কঠোর বিধান দেওয়া হলো, ঋতুস্রাব শুরুর পরেও যদি কোনো কন্যা কুমারী থাকে, তবে তাঁর পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকগামী হবেন (Parashara Smriti, 7.6-9)। এমনকি ঋতুমতী অবিবাহিত কন্যাকে 'বৃষলী' বা শূদ্রানীর সমতুল্য অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হলো। 'নগ্নিকা' শব্দের অর্থের বিবর্তন এই অধঃপতনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৃহ্যসূত্রে 'নগ্নিকা' বলতে বোঝানো হতো সেই নারীকে যিনি আসন্ন যৌবনা বা স্বামীর সামনে বস্ত্রহীন হওয়ার যোগ্য; অথচ পরবর্তী ভাষ্যকাররা এর অর্থ করলেন, 'যে বালিকা এখনো বস্ত্র পরিধান করতে শেখেনি' (Bhattacharya, 2005, p. 58)। এই আইনি পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব ছিল নারীর জন্য বিপর্যয়কর। বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীকে শিক্ষা ও উপনয়ন সংস্কার থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত করা হলো। একজন ৮ বা ১০ বছরের বালিকা, যার জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, তাকে স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া হলো। এটি ছিল নারীর যৌনতা ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এক সুপরিকল্পিত কৌশল (Doniger, 2010)।

বয়সের এই অধঃপতনের সাথে সাথে পতি নির্বাচনে নারীর যে 'এজেন্সি' বা কর্ত্রীসত্তা ছিল, তাও ক্রমান্বয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে 'সমনা' নামক এক ধরনের সামাজিক উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে যুবক-যুবতীরা অবাধে মেলামেশা করতে পারতেন এবং একে অপরের গুণাবলি যাচাই করে সঙ্গী নির্বাচন করতেন (Atharvaveda, 2.36.1)। এই সময় 'গান্ধর্ব বিবাহ' বা প্রেম করে বিয়ে সমাজস্বীকৃত ছিল এবং একে নিন্দনীয় মনে করা হতো না। মহাকাব্যের যুগেও ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলোতে 'স্বয়ম্বর' প্রথার প্রচলন ছিল, যেখানে দময়ন্তী, সাবিত্রী বা ইন্দুমতীর মতো নারীরা পিতার উপস্থিতিতেই নিজেদের পছন্দের পুরুষকে মালা পরিয়ে বরণ করতেন। মহাভারতে সাবিত্রী যখন সত্যবানকে পতি হিসেবে নির্বাচন করেন, তখন পিতা অশ্বপতি বা ঋষি নারদ আপত্তি জানালেও সাবিত্রী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাই জয়ী হয়েছিল (Mahabharata, Vana Parva, 294.25)। এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, নারীর সম্মতির একটি সামাজিক মূল্য ছিল। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে, বিশেষত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে, পতি নির্বাচনে নারীর এই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকারকে 'লজ্জাজনক', 'উচ্ছৃঙ্খলতা' এবং 'কলঙ্কজনক' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়। মনুসংহিতায় (৩.২৭-৩৪) আট প্রকার বিবাহের মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলা হলো, যেখানে পিতা বিদ্বান ও সদাচারী পাত্রকে আমন্ত্রণ করে 'কন্যাদান' করবেন। এখানে কন্যার সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই, পিতা যাকে যোগ্য মনে করবেন, কন্যা তাকেই দেবতা জ্ঞান করে মেনে নেবেন। অন্যদিকে, প্রেমভিত্তিক 'গান্ধর্ব' বিবাহকে শাস্ত্রকাররা নিরুৎসাহিত করলেন এবং একে 'কামজ' বা কেবল কামনাসম্ভূত বলে অভিহিত করে এর মর্যাদা হ্রাস করলেন (Manu Smriti, 3.32)। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যদিও নারীদের প্রেম ও পতি নির্বাচনের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মূলধারার আইনি কাঠামোতে নারীর 'পছন্দ' বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকের এখতিয়ারে চলে যায় (Vatsyayana, Kamasutra, 3.1)। এর ফলে বিবাহ আর দুটি মানুষের মিলন রইল না, তা হয়ে দাঁড়াল দুটি পরিবারের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক লেনদেন, যেখানে নারী হলেন বিনিময়যোগ্য বস্তু।

নারী যখন নির্বাচনের কর্ত্রী থেকে কর্মে পরিণত হলেন, তখন তাঁকে নির্বাচন করার জন্য তৈরি হলো এক জটিল ও বৈষম্যমূলক 'যোগ্যতার রাজনীতি' বা 'Politics of Eligibility'। প্রাচীন হিন্দু বিবাহে কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীকে মূলত তাঁর প্রজনন ক্ষমতা এবং নমনীয়তার ভিত্তিতে বিচার করা হতো। এখানে নারীর মানবিক গুণাবলি, মেধা বা ব্যক্তিত্বের চেয়ে তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লক্ষণগুলোই প্রাধান্য পেত। মনুসংহিতা ও বিভিন্ন গৃহসূত্রে কনে নির্বাচনের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, তা আধুনিক দৃষ্টিতে 'ইউজেনিক্স' (Eugenics) বা সুপ্রজননবিদ্যার এক আদিম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রূপ বলে মনে হতে পারে। মনু (৩.৮–১০) এমন পরিবারে বিবাহ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন, যেখানে কোনো পুত্রসন্তান নেই, যেখানে বেদচর্চা হয় না বা

যেখানে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি (যেমন যক্ষ্মা বা মৃগীরোগ ইত্যাদি) আছে। এটি হয়তো বংশগত রোগব্যাধি এড়ানোর একটি আদিম কৌশল ছিল। কিন্তু এর বাইরে কনের ব্যক্তিগত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর। বলা হয়েছে, এমন কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়, যিনি অতিরিক্ত পিঙ্গলবর্ণা, অধিক লোমশ বা লোমহীনা, অথবা বাচাল (Manu Smriti, 3.8)। এমনকি কনের নামের ওপর ভিত্তি করেও তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হতো। মনুর মতে, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পক্ষী, সর্প বা ভীতিপ্রদ কোনো বস্তুর নামে নামযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করা অশুভ। এর পরিবর্তে 'হংস' বা 'বারন' (হাতি)-এর মতো গমনভঙ্গিযুক্তা, কোমলাঙ্গী ও শুভনাম্নী কন্যাই প্রশস্তা (Manu Smriti, 3.9-10)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১.২.৫.১৬) প্রশস্ত নিতম্ব ও সরু কোমরের নারীকে সন্তান ধারণের জন্য আদর্শ বলা হয়েছে (Satapatha Brahmana, 1.2.5.16)। বিষ্ণু পুরাণ ও মৎস্য পুরানেও একই ধরনের শারীরিক লক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো গৃহ্যসূত্রে কনে পরীক্ষার এক অদ্ভুত পদ্ধতির উল্লেখ আছে, যেখানে মাটির ঢেলা বা পিণ্ড ব্যবহার করে কনের ভাগ্য পরীক্ষা করা হতো। শ্মশানের মাটি বা চতুষ্পথ বা রাস্তার মোড়ের মাটি স্পর্শ করলে সেই কন্যাকে অমঙ্গলজনক বা কুলনাশী মনে করা হতো (Ashvalayana Grihyasutra, 1.5)। এই সমস্ত বিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক নারীকে ঘরে তোলা, যিনি হবেন স্বাস্থ্যবতী (পুত্র উৎপাদনের জন্য) এবং মানসিকভাবে অনুগত। নারীর বুদ্ধিমত্তা বা মেধার চেয়ে তাঁর 'শুভ লক্ষণ' বা 'Superstitious Signs'-ই ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীকে কার্যত একটি 'পণ্য' হিসেবে যাচাই-বাছাই করা হতো, যেখানে তাঁর মানবিক সত্তা গৌণ হয়ে পড়ত।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার আরেকটি জটিল, কঠোর এবং আইনি দিক ছিল 'নিষিদ্ধ সম্পর্ক' বা 'Prohibited Degrees of Relationship'-এর বেড়াজাল। হিন্দু বিবাহ আইনের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল, বর ও কনেকে অবশ্যই 'সপিণ্ড' এবং 'সগোত্র' হওয়া চলবে না। অর্থাৎ, তাঁরা রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে নির্দিষ্ট পুরুষ পর্যন্ত সম্পর্কিত হতে পারবেন না এবং একই বংশ বা ঋষির গোত্রভুক্ত হতে পারবেন না। 'সপিণ্ড' ও 'সগোত্র' বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞা বৈদিক যুগে এতটা কঠোর ছিল না। সেখানে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের (Cross-cousin marriage) কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত এরূপ বিবাহের অনুমোদন ছিল (Satapatha Brahmana, 1.8.3.6)। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে, বিশেষত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে, একে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। মনুর বিধান অনুযায়ী (৩.৫), পিতার দিকে সাত পুরুষ এবং মাতার দিকে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিয়মের লঙ্ঘন হলে সেই বিবাহকে কেবল বাতিলই ঘোষণা করা হতো না, বরং দম্পতিকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো এবং সমাজচ্যুত হতে হতো। রঘুনন্দন ও বিজ্ঞানেশ্বর (মিতাক্ষরা প্রণেতা) এই সপিণ্ড তত্ত্বকে আরও জটিল গাণিতিক সূত্রে রূপ দেন। বিজ্ঞানেশ্বর সপিণ্ডতার নতুন ব্যাখ্যা দেন,

'পিণ্ড' মানে কেবল শ্রাদ্ধের পিণ্ড নয়, বরং 'শরীর'। অর্থাৎ, যাদের শরীরে একই পূর্বপুরুষের রক্তকণা বা অবয়ব (Body Particles) বিদ্যমান, তারাই সপিণ্ড (Kane, 1941, Vol. II, p. 454)। এই ব্যাখ্যার ফলে নিষিদ্ধ সম্পর্কের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

এই কঠোর নিয়মের পেছনে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলে ধারণা করা যায়। প্রথমত, 'বায়োলজিক্যাল' বা জিনগত বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের ফলে সৃষ্ট শারীরিক ত্রুটি এড়ানো। দ্বিতীয়ত, এবং সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক। ভিন্ন গোত্রে বিবাহের (Exogamy) মাধ্যমে সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তার জাল বিস্তার করতে চেয়েছিল এবং বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু নারীর জন্য এই নিয়ম এক শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়। একে তো বাল্যবিবাহের চাপ, তার ওপর সগোত্র ও সপিণ্ড বাদের কারণে বিবাহের ক্ষেত্র (Pool of eligible grooms) অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে পিতা-মাতারা অনেক সময় 'কুলীন' বা উচ্চবংশের পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অসম বয়সী বিবাহ বা বহুবিবাহপ্রথা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। বাংলায় 'কুলীন প্রথা'র মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোর উত্থানের পেছনে এই কঠোর গোত্র ও সপিণ্ড নিয়মের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

৪. বিবাহের ধরন ও আচার: লৈঙ্গিক রাজনীতির কাঠামোগত বিশ্লেষণ

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান নির্ণয়ে বিবাহের শ্রেণিকরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। আপাতদৃষ্টিতে এই শাস্ত্রীয় বিভাজন ও মাঙ্গলিক আচারগুলোকে নিছক ধর্মীয় প্রথা বা সামাজিক রীতি মনে হলেও, এর গভীরতর বিশ্লেষণে উন্মোচিত হয় এক সূক্ষ্ম লৈঙ্গিক রাজনীতি বা 'Gender Politics' (Chakravarti, 1993, p. 280)। ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিবাহের যে আটটি ধরন বা 'অষ্টবিধ বিবাহ'-এর প্রবর্তন করেছিলেন এবং বৈদিক যুগ থেকে সূত্র যুগে উত্তরণের পথে যেসব আচার-অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তার প্রতিটি স্তরে নারীর কর্ত্রীসত্তার ক্রমশ বিলুপ্তি এবং পিতৃতান্ত্রিক মালিকানার কঠোর বিনির্মাণ লক্ষ করা যায়। বস্তুত, বিবাহের ধরন ও আচারের এই বিবর্তন কেবল প্রথার পরিবর্তন নয়; বরং এটি নারীর দেহ ও অস্তিত্বের ওপর পুরুষের আইনি ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সুসংহত কাঠামোরই বহিঃপ্রকাশ (Altekar, 1959, p. 49)।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, বিশেষত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদের মতো স্মৃতিকারগণ বিবাহকে আটটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন: ব্রাহ্ম, দৈব, আর্শ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ (মনুসংহিতা: ৩.২০–২১; যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি: ১.৫৮–৬১)। এই শ্রেণিকরণের ভিত্তি কোনো রোমান্টিক বা মানবিক সম্পর্ক ছিল না; বরং এর ভিত্তি ছিল নারীর যৌনতার হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং সেখানে অভিভাবকের কর্তৃত্বের মাত্রা। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় প্রথম চারটি বিবাহরীতিকে

(ব্রাহ্ম, দৈব, আর্শ ও প্রাজাপত্য) 'প্রশস্ত' বা ধর্মসম্মত এবং শেষ চারটি রীতিকে 'অপ্রশস্ত' বা নিন্দনীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে (মনুসংহিতাঃ ৩.২৪)। এই বিভাজনের রাজনীতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ করলে দেখা যায়, 'প্রশস্ত' বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিবাহগুলোতে নারীর নিজস্ব ইচ্ছা বা সম্মতির কোনো স্থান নেই; এখানে পিতা বা অভিভাবক কন্যাকে অলংকৃত করে 'দান' বা উপহার হিসেবে বরের হাতে তুলে দিচ্ছেন (Kane, 1974, p. 533)। নারীর নিষ্ক্রিয়তা এখানে আভিজাত্যের লক্ষণ। অন্যদিকে, যেসব বিবাহে নারীর নিজস্ব পছন্দ বা সম্মতি বা অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা আছে (যেমন গান্ধর্ব বা রাক্ষস), সেগুলোকে সামাজিকভাবে নিচু বা পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'ব্রাহ্ম' বিবাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন করার মধ্য দিয়ে হিন্দু আইনপ্রণেতারা কার্যত নারীর ওপর পিতার নিরঙ্কুশ মালিকানাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে পিতা একজন বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পট্টবস্ত্র ভূষিতা ও সালংকারা কন্যাকে সম্প্রদান করেন (মনুসংহিতাঃ ৩.২৭)। এখানে কন্যা কোনো ব্যক্তি নন, বরং একটি 'পুণ্যদ্রব্য', যার দানের মাধ্যমে পিতা পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করেন। 'দৈব' ও 'প্রাজাপত্য' বিবাহও এই একই দর্শনের ভিন্নরূপ মাত্র, যেখানে নারীকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ বা ধর্মাচরণের সঙ্গী হিসেবে অর্পণ করা হয় (মনুসংহিতাঃ ৩.২৮, ৩০)। 'আর্শ' বিবাহে বরের কাছ থেকে গো-দান গ্রহণ করে কন্যা সম্প্রদান করা হতো। যদিও স্মৃতিকাররা একে 'বিক্রয়' বলতে নারাজ ছিলেন, তবুও আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি নারীর বিনিময়ে এক ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন বা 'Bride Price'-এরই নামান্তর, যা নারীর পণ্যায়ণের (Commodification) ইঙ্গিতবাহী (Altekar, 1959, p. 39; Menski, 2003, p. 140)।

বিপরীত চিত্র দেখা যায় 'গান্ধর্ব' বিবাহের ক্ষেত্রে। বৈদিক ও মহাকাব্যিক যুগে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা পুরুরবা-উর্বশীর মতো গান্ধর্ব বিবাহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকলেও, স্মৃতিশাস্ত্রে একে 'কামজ' বা কেবল কামনাসম্ভূত বলে খাটো করা হয়েছে (মনুসংহিতাঃ ৩.৩২)। গান্ধর্ব বিবাহে নারীর স্বয়ং নির্বাচনের অধিকার বা প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। কারণ, নারী যদি নিজেই নিজের পতি নির্বাচন করেন, তবে বর্ণশুদ্ধি ও গোত্ররক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে এবং পিতার কর্তৃত্ব খর্ব হয়। তাই বাৎস্যায়ন বা কালিদাসের সাহিত্যে গান্ধর্ব বিবাহের রোমান্টিকতা থাকলেও, মনুর কঠোর শাসনে তা নিন্দনীয় বিবাহে পরিণত হয়। আরও নিচে অবস্থান 'আসুর' বিবাহের, যেখানে বর অর্থ দিয়ে কন্যাকে কিনে নেন (মনুসংহিতাঃ ৩.৩১)। এটি সরাসরি নারী পাচার বা বিক্রয়ের নামান্তর হলেও তৎকালীন বণিক বা নিম্নবর্ণের সমাজে এর প্রচলন ছিল। আর 'রাক্ষস' ও 'পৈশাচ' বিবাহ ছিল নারীর প্রতি পুরুষের চরম সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের আইনি স্বীকৃতি। যুদ্ধজয়ের পর নারীকে জোরপূর্বক হরণ করা (রাক্ষস) বা নিদ্রিত/মদ্যপ অবস্থায় নারীর শ্লীলতাহানি করে তাঁকে বিবাহে বাধ্য করা (পৈশাচ), উভয়

ক্ষেত্রেই নারীর ইচ্ছা বা সম্মতিকে পদদলিত করা হয়েছে (মনুসংহিতা: ৩.৩৩-৩৪)। পৈশাচ বিবাহকে সবচেয়ে অধম বলা হলেও, একে 'বিবাহ' হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা নারীর সামাজিক আত্তীকরণ, যদিও তা নারীর জন্য ছিল চূড়ান্ত অসম্মানের।

বিবাহের এই ধরনগুলোর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান, যার কেন্দ্রে রয়েছে 'কন্যাদান' ও 'সপ্তপদী'। 'কন্যাদান' বা 'Gift of the Virgin' ধারণাটি হিন্দু বিবাহের আইনি ও আধ্যাত্মিক মর্মমূল। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে দাতা (পিতা) গ্রহীতার (বর) কাছে কন্যা সম্প্রদানের মাধ্যমে কন্যার ওপর তাঁর সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করেন। কন্যাদানের মন্ত্র ও আচারের মাধ্যমে নারীর গোত্রান্তর ঘটে, অর্থাৎ তিনি পিতার গোত্র ও পিণ্ডদানের অধিকার হারিয়ে স্বামীর গোত্রে লীন হন (Kane, 1974, p. 465)। এই গোত্রান্তর প্রক্রিয়াটি নারীর নিজস্ব আইনি সত্তার বিলোপ ঘটিয়ে তাঁকে স্বামীর পরিবারের অধিকারভুক্ত করে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক গভীর আইনি হস্তান্তর প্রক্রিয়া, যার ফলে পরবর্তীকালে নারী তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন (Agnes, 1999, p. 54)। মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে এই দানকে 'মহাদান' বলা হয়েছে, কারণ নিজের ঔরসজাত কন্যাকে অন্যের হাতে নিঃশর্তভাবে তুলে দেওয়ার চেয়ে বড় ত্যাগ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আর কিছু হতে পারে না (মহাভারত: অনুশাসন পর্ব)। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, যাঁকে দান করা হচ্ছে, তাঁর সম্মতি কি আদৌ প্রাসঙ্গিক? যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য স্মৃতিকারদের ভাষ্যমতে, বিবাহে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই কন্যার সম্প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিবাহ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত আইনি বৈধতা দান করে 'সপ্তপদী' বা সাতপাক ঘোরার আচার। মনু ও কুল্লুক ভট্টের মতে, সপ্তম পদক্ষেপটি ফেলার আগ পর্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় না এবং তা বাতিলযোগ্য থাকে (মনুসংহিতা: ৮.২২৭)। এই আচারটির প্রতীকী গুরুত্ব অপরিসীম। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বর ও কনে সাতটি প্রতিজ্ঞা করেন– খাদ্য, শক্তি, ধন, সুখ, প্রজনন, ঋতু ও সখ্যের জন্য (আশ্বলায়ন– ১.৭.১২-১.৭.১৪)। আপাতদৃষ্টিতে একে পারস্পরিক অঙ্গীকার মনে হলেও, মন্ত্রগুলোর ভাষা ও গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানেও পুরুষই চালক বা কর্তা। বর কনেকে নির্দেশ দেন: "মম অনুব্রতা ভব" (আমার অনুগামী হও)। কনে বরের বামপাশে অবস্থান করেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে বরের অনুসরণ করেন (পারস্কর গৃহ্যসূত্র: ১.৮)। বৈদিক যুগে এই আচারগুলোতে নারীর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার ছিল এবং তিনি যজ্ঞের সমান অংশীদার ছিলেন। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দেখা যায়, স্ত্রী নিজেই মন্ত্র পাঠ করছেন এবং যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন (অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র: ১.৭.৩)। কিন্তু পরবর্তী স্মৃতির যুগে, শূদ্র ও নারীর জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, পুরোহিতই কনের হয়ে মন্ত্র পাঠ করেন এবং কনে কেবল নীরব

শ্রোতায় পরিণত হন। এই নীরবতা নারীর অধস্তনতার এক শক্তিশালী প্রতীক (Altekar, 1959, p. 204)।

‘পাণিগ্রহণ’ আচারটিও লৈঙ্গিক ক্ষমতার এক চমৎকার নিদর্শন। বর যখন কনের হাত ধরেন, তখন তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেনঃ “গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।” (আমি সৌভাগ্যের জন্য তোমার হস্ত গ্রহণ করছি, যাতে তুমি আমার সাথে বার্ধক্য পর্যন্ত অটুট থাকো) (ঋগ্বেদঃ ১০.৮৫.৩৬)। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটি নারীর সুরক্ষা ও সাহচর্যের দ্যোতক ছিল। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় ‘হস্ত ধারণ’ মানে ‘অধিকার গ্রহণ’ বা কাস্টডি নেওয়া। পিতা যেমন রক্ষক ছিলেন, স্বামী এখন সেই ভূমিকার স্থলাভিষিক্ত হলেন। নারীর নিজের শরীরের ওপর আর নিজের অধিকার রইল না। এছাড়া ‘অশ্মারোহণ’ বা পাথরের ওপর পা রাখার আচারে কনেকে পাথরের মতো দৃঢ় হতে বলা হয়, যাতে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন (সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রঃ ১.১৩.১২)। কিন্তু বৈপরীত্য হলো, যে নারীকে পাথরের মতো শক্ত হতে বলা হচ্ছে, সেই নারীকেই আবার স্বামীর সামনে লতার মতো নমনীয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিবাহ প্রক্রিয়ার বিবর্তনও নারীর অবস্থান পরিবর্তনের এক ঐতিহাসিক সাক্ষী। বৈদিক যুগে বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল মূলত বর ও কনের যৌথ যজ্ঞ, যেখানে ‘চতুর্থীকর্ম’ বা চতুর্থ দিনে সহবাসের আচারটি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ইঙ্গিত দিত। সেখানে বধূকে ‘সম্রাজ্ঞী’ হওয়ার আশীর্বাদ করা হতো, যাতে তিনি শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ-দেবরের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেন (ঋগ্বেদঃ ১০.৮৫.৪৬)। কিন্তু পুরাণ ও স্মৃতির যুগে বাল্যবিবাহের প্রবর্তনের ফলে আচারগুলোর অর্থ বদলে যায়। একজন আট বা দশ বছরের বালিকা, যার মন্ত্র বোঝার বা প্রতিজ্ঞা করার কোনো মানসিক পরিপক্বতা নেই, তার ক্ষেত্রে ‘সপ্তপদী’ বা ‘হৃদয়-স্পর্শ’ (হৃদয় ছোঁয়ার আচার) ছিল এক ধরনের প্রহসন। ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানটি দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মিলন থেকে সরে এসে দুটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিতে পরিণত হল। গরুড় পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণে বিবাহ-পরবর্তী যেসব আচার বা ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা মূলত নারীর সতীত্ব রক্ষা ও পতিসেবাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত (গরুড় পুরাণঃ ১.৯৫)। সেখানে নারীর নিজস্ব আধ্যাত্মিক মুক্তি বা মোক্ষের কোনো অবকাশ নেই; পতিসেবাই তাঁর একমাত্র যজ্ঞ ও তপস্যা।

৫. দাম্পত্য জীবনঃ অধিকার, কর্তব্য ও পারিবারিক অবস্থান

প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও আইনি কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণে দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে নারীর অধিকার, কর্তব্য ও পারিবারিক অবস্থানের এক জটিল এবং বহুমাত্রিক চিত্র উন্মোচিত হয়। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও যৌথ

অংশীদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত (Altekar, 1959, p. 96)। ঋগ্বেদে 'দম্পতি' শব্দটির ব্যবহারই প্রমাণ করে যে গৃহের মালিকানা ও কর্তৃত্বে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল (ঋগ্বেদ: ৫.৩.২; ৮.৩১.৫)। সেখানে স্ত্রীকে কেবল 'জায়া' (যিনি সন্তান ধারণ করেন) বা 'জানী' (যিনি জননী) বলা হয়নি, বরং 'পত্নী' (যজ্ঞের অংশীদার) এবং 'গৃহিণী' (গৃহের কর্ত্রী) হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে (Altekar, 1959, p. 97)। বৈদিক মন্ত্রে স্বামীকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, "তুমিই আমি, আমিই তুমি", যা দাম্পত্য জীবনের এক অদ্বৈত ও অবিচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক সংযোগের ইঙ্গিত দেয় (অথর্ববেদ: ১৪.২.৭১)। কিন্তু কালক্রমে স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগে এই সমতার ভারসাম্য নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে একতরফা পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে পর্যবসিত হয় (Kane, 1974, p. 562)। পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রগুলোতে দাম্পত্য জীবনকে নারীর জন্য একটি পবিত্র 'সেবাশ্রম' হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়, যেখানে পতিসেবাই নারীর পরম ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় হিসেবে সাব্যস্ত হয় (মনুসংহিতা: ৫.১৫৫)।

দাম্পত্য জীবনে নারীর কর্তব্য ও আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণে 'পতিব্রতা ধর্ম' বা 'পাওয়ার অফ চেস্টিটি'র ধারণাটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে (Leslie, 1989, p. 274)। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে পতিব্রতা নারীর যে আদর্শ চিত্রিত হয়েছে, তা মূলত নারীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগের মহিমা কীর্তন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী বা গান্ধারীর মতো চরিত্রগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন স্বামীর সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজের সত্তা বিসর্জন দেওয়াই নারীজীবনের সার্থকতা (মহাভারত, বনপর্ব: ২৯৬.২০–২৩)। মনুসংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্বামীর গুণাবলি যেমনই হোক না কেন, তিনি দুশ্চরিত্র, লম্পট বা গুণহীন হলেও, স্ত্রী তাঁকে 'দেবতা' জ্ঞান করে সেবা করবেন (মনুসংহিতা: ৫.১৫৪)। এই বিধানের মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবনে নারীর ওপর স্বামীর নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে আইনি ও ধর্মীয় বৈধতা দেওয়া হয়েছে। পতিব্রতা ধর্মের এই কঠোর অনুশাসন নারীকে এমন এক মানসিক ও সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল যে, তিনি পারিবারিক জীবনে স্বামীর যেকোনো অন্যায় আচরণ বা অবহেলাকে 'নিয়তি' বা 'পূর্বজন্মের কর্মফল' হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হতেন (Kane, 1974, p. 563)। ফলে দাম্পত্য কলহ বা নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিবাদের কোনো আইনি বা সামাজিক পরিসর অবশিষ্ট ছিল না।

দাম্পত্য সম্পর্কের আরেকটি বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক দিক ছিল বহুবিবাহ ও একগামিতার দ্বান্দ্বিক অবস্থান। হিন্দু বিবাহ আইনে পুরুষের জন্য বহুবিবাহের সুযোগ অবারিত থাকলেও নারীর জন্য একগামিতা বা সতীত্ব রক্ষা ছিল অলঙ্ঘনীয় শর্ত (যোগীরাজ, ১৯৫৭, পৃ. ৪২)। বৈদিক যুগেও রাজন্যবর্গ ও ঋষিদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু সাধারণ সমাজে একগামিতাই ছিল আদর্শ (Macdonell & Keith, 1912, p. 478)। তবে স্মৃতি ও মহাকাব্যের যুগে বহুবিবাহ অভিজাত শ্রেণির পুরুষের আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত হয়। পুরুষ

চাইলেই বংশরক্ষা বা নিছক কামনার বশবর্তী হয়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতো স্মৃতিকারগণ পুরুষের পুনর্বিবাহের জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছিলেন, যেমন প্রথমা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা কেবল কন্যাসন্তান প্রসব, কিন্তু বাস্তবে পুরুষরা অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই বা সামান্য অজুহাতে একাধিক বিবাহ করতেন (মনুসংহিতা: ৯.৮০-৮১)। এর ফলে পরিবারে 'সপত্নী' বা সতীনদের মধ্যে যে অশুভ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হতো, তা নারীর মানসিক প্রশান্তি ও পারিবারিক অবস্থানকে বিষিয়ে তুলত। অথর্ববেদের বিভিন্ন মন্ত্রে সতীনকে বশীকরণ বা ধ্বংস করার যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে বহুবিবাহ নারীর জীবনে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছিল (অথর্ববেদ: ৩.১৮)। স্বামীর অনুরাগ লাভের জন্য স্ত্রীদের এই অন্তহীন লড়াই তাঁদের পারিবারিক অবস্থানকে আরও দুর্বল ও পরনির্ভরশীল করে তুলেছিল (Altekar, 1959, p. 106)।

পরিবারে নারীর অবস্থান ছিল এক প্যারাডক্স বা বৈপরীত্যে ভরা। তাত্ত্বিকভাবে শাস্ত্রকাররা নারীকে 'গৃহলক্ষ্মী' বা 'সম্রাজ্ঞী' বলে সম্বোধন করেছেন। মহাভারতে ভীষ্ম বলেছেন, "গৃহকে গৃহ বলা যায় না; গৃহ প্রকৃতপক্ষে গৃহিণীই। গৃহিণীবিহীন গৃহ অরণ্যের সদৃশ।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব: ১৪৪.৬)। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। পরিবারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতকে খুব কমই গুরুত্ব দেওয়া হতো (Bader, 2013, p. 78)। মনুসংহিতার বিখ্যাত সেই উক্তি, "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি", নারীর আজীবন অভিভাবকত্বের অধীনতাকে আইনি সিলমোহর দিয়েছিল (মনুসংহিতা: ৯.৩)। যৌবনে স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণে থাকা মানে কেবল শারীরিক নিরাপত্তা নয়, বরং স্বামীর মত ও পথের অনুগামী হওয়া। স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হতেন বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করতেন, তবে তাঁকে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া ছিল (মনুসংহিতা: ৯.৮৩)। এমনকি স্বামী চাইলে 'দুষ্টা' বা অবাধ্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারতেন, যদিও হিন্দু বিবাহে 'ডিভোর্স' বা বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না (শাস্ত্রী, ১৪২০, পৃ. ১৩৫)। এই 'ত্যাগ' মানে বিবাহ বিচ্ছেদ নয়, বরং স্ত্রীর ভরণপোষণ ও দাম্পত্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা, যা নারীর জন্য ছিল এক সামাজিক মৃত্যু।

তবুও, প্রাচীন সাহিত্যে ও শিলালিপিতে এমন কিছু নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা এই প্রথাগত কাঠামোর মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নগরবধু বা গণিকাদের পাশাপাশি গৃহস্থ নারীদের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে তাঁরা গৃহকর্মের পাশাপাশি উদ্যানচর্চা, শিল্পকলা এবং এমনকি স্বামীর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন (Vatsyayana, Trans. 2002, 4.1.32-35)। কিছু কিছু স্মৃতিশাস্ত্রে, যেমন যাজ্ঞবল্ক্য

স্মৃতিতে, স্ত্রীকে স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি: ১.৭৫)। কিন্তু এগুলো ছিল ব্যতিক্রম। সাধারণ চিত্রটি ছিল সেবার, ত্যাগের এবং নীরবতার। স্বামীর পদসেবা করা, তাঁর প্রসাদ ভোজন করা এবং তাঁর প্রতিটি আদেশের অনুগত থাকা– এগুলোই ছিল আদর্শ স্ত্রীর দৈনন্দিন কর্ম। গরুড় পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে পতিব্রতা স্ত্রীর যে দৈনন্দিন রুটিন বর্ণনা করা হয়েছে, তা আধুনিক দৃষ্টিতে দাসত্বের নামান্তর মনে হতে পারে (Kane, 1974, p. 565)। সেখানে বলা হয়েছে, স্বামী যদি ক্রুদ্ধ হন, তবুও স্ত্রী মিষ্টভাষী হবেন; স্বামী যদি প্রহার করেন, তবুও স্ত্রী প্রসন্ন থাকবেন (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড: ৪৭.৫৪)। এই ধরনের নির্দেশাবলি প্রমাণ করে যে, দাম্পত্য জীবনে সমতার কোনো স্থান ছিল না; বরং এটি ছিল প্রভু ও দাসের সম্পর্কের এক আধ্যাত্মিক সংস্করণ।

৬. অর্থনৈতিক ও আইনি দুর্বলতা: স্ত্রীধন ও উত্তরাধিকার

প্রাচীন হিন্দু সমাজকাঠামোতে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে তাঁর অর্থনৈতিক স্বকীয়তা ও সম্পত্তির ওপর মালিকানার প্রশ্নটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অনুষঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর প্রতি সম্মানজনক উক্তি বা স্ত্রীধনের মতো বিশেষ বিধানের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও, গভীরতর আইনি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উন্মোচিত হয় এক কাঠামোগত বঞ্চনার ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন হিন্দু আইন নারীর অর্থনৈতিক সত্তাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত ও সংকুচিত করেছিল যে, তিনি কখনোই একজন পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে বিকশিত হতে পারেননি (Altekar, 1959, p. 214)। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা, স্বামীর সম্পত্তিতে সীমিত অধিকার এবং স্ত্রীধনের ওপর পুরুষের প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ– এই ত্রিমুখী আইনি শৃংখল নারীকে আজীবন পুরুষের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে রেখেছিল, যা তাঁর সামাজিক অধীনতাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মূল ভিত্তি ছিল পিতৃতান্ত্রিক গোত্র ব্যবস্থা ও পিণ্ডদান তত্ত্ব। এই তত্ত্বানুযায়ী, কেবল সেই ব্যক্তিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন, যিনি মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক কল্যাণের জন্য পিণ্ডদান করতে সক্ষম (Diwan, 2013, p. 345)। যেহেতু শাস্ত্রীয় বিধানমতে নারী পিণ্ডদানে অক্ষম এবং বিবাহের মাধ্যমে তিনি পিতার গোত্র ত্যাগ করে স্বামীর গোত্রে লীন হন (গোত্রান্তর), তাই পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁর কোনো সহজাত অধিকার স্বীকৃত হয়নি। বৈদিক যুগেও, যেখানে নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল, সেখানেও সম্পত্তির মালিকানা মূলত পুরুষের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ঋগ্বেদে 'ভ্রাতৃহীনা কন্যা'র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কিছু ইঙ্গিত থাকলেও, সাধারণ নিয়মে কন্যাকে পিতার সম্পত্তির অংশীদার ভাবা হতো না (Macdonell & Keith, 1912, p. 486)। পরবর্তী স্মৃতি ও সংহিতার যুগে এই বঞ্চনাকে আইনি রূপ দেওয়া হয়। মনুসংহিতা ও পরবর্তীকালে দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা আইনের বিধানে স্পষ্ট করা হয় যে, পুত্রই পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী; কন্যা কেবল বিবাহের সময়

কিছু উপহার বা যৌতুক লাভের অধিকারী মাত্র (Manusmriti, 9.185)। এই আইনি কাঠামোর মাধ্যমে নারীকে পিতার পরিবারে কেবল 'অতিথি' এবং স্বামীর পরিবারে 'আশ্রিতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সম্পত্তির এই লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন নারীকে সমাজ ও পরিবারের মূল অর্থনৈতিক স্রোতধারা থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

নারীর সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে স্ত্রীধনের ধারণাটি প্রায়শই একটি ইতিবাচক ব্যতিক্রম হিসেবে উলেখ করা হয়। আইনি পরিভাষায় স্ত্রীধন হলো সেই সম্পত্তি, যা নারী বিবাহের সময় বা পরে উপহার হিসেবে লাভ করেন এবং যার ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানা থাকার কথা। মনুসংহিতায় ছয় প্রকার স্ত্রীধনের উলেখ রয়েছেঃ অধ্যগ্নি (অগ্নির সামনে প্রাপ্ত), অধ্যাবাহনিক (পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে যাওয়ার সময় প্রাপ্ত), প্রীতিদত্ত (স্নেহবশত প্রদত্ত) এবং ভ্রাতা, মাতা বা পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার (Manusmriti, 9.194)। যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন স্ত্রীধনের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। তাত্ত্বিকভাবে, স্ত্রীধন ছিল নারীর নিজস্ব সম্পদ, যা তিনি ইচ্ছামতো দান, বিক্রয় বা ভোগ করতে পারতেন এবং যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাদের ওপর বর্তাতো (Yajnavalkya Smriti, 2.143)। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রীধনের ওপর নারীর এই অধিকার ছিল অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ ও ভঙ্গুর। প্রথমত, স্থাবর সম্পত্তি বা জমিজমা স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত হলেও, স্বামী জীবিত থাকাকালীন স্ত্রী তা বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত, আপৎকালীন সময়ে বা পরিবারের প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীর এই ধন ব্যবহার করার আইনি অধিকার রাখতেন। কাত্যায়ন স্পষ্টই বলেছেন যে, স্বামী যদি দুর্ভিক্ষ, ধর্মকার্য বা চিকিৎসার প্রয়োজনে স্ত্রীধন ব্যয় করেন, তবে তিনি তা ফেরত দিতে বাধ্য নন (Kane, 1946, p. 794)। এর ফলে, যে সম্পত্তিকে নারীর 'নিজস্ব' বলা হচ্ছে, তাও পরোক্ষভাবে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল না। বস্তুত, স্ত্রীধন ছিল নারীর উত্তরাধিকারহীনতার এক ধরনের 'সান্ত্বনা পুরস্কার' যা তাঁকে মূল সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনি বৈধতা প্রদান করত।

অর্থনৈতিক দুর্বলতার আরেকটি ভয়াবহ দিক ছিল যৌতুক বা 'বরদক্ষিণা' এবং পণপ্রথার বিবর্তন। বৈদিক যুগে 'বহতু' বা যৌতুক ছিল মূলত কন্যাকে দেওয়া স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপহার, যা নবদম্পতির নতুন সংসার শুরুর সহায়ক হিসেবে গণ্য হতো (Rigveda, 10.85.13)। অথর্ববেদে দেখা যায়, রাজকন্যারা বিবাহের সময় প্রচুর গো-সম্পদ ও রত্নালঙ্কার নিয়ে পতিগৃহে যেতেন (Atharvaveda, 14.1.13)। এটি ছিল স্নেহের নিদর্শন এবং নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক। কিন্তু কালক্রমে, বিশেষত মধ্যযুগ ও পরবর্তী সময়ে, এই স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপহার এক বাধ্যতামূলক দাবিতে রূপান্তরিত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে বরদক্ষিণার উল্লেখ থাকলেও, তা ক্রমশ সামাজিক আভিজাত্য ও কৌলিন্য প্রথার অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। কুলীন প্রথার উদ্ভবের ফলে উচ্চবর্ণের পাত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সর্বস্ব বিক্রি করে বরের দাবি মেটাতে বাধ্য হতেন। যৌতুক তখন আর নারীর সম্পত্তি (স্ত্রীধন) রইল না; তা হয়ে দাঁড়াল

বরের পরিবারের প্রাপ্য 'ফি' বা মূল্য। এই রূপান্তর নারীকে পরিবারের জন্য এক অর্থনৈতিক বোঝায় পরিণত করে। কন্যাসন্তানের জন্ম তখন আর আনন্দের উৎস রইল না, বরং তা দুশ্চিন্তা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাপই পরবর্তীকালে কন্যাভ্রুণ হত্যা ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায় 'আসুর' বিবাহ ও কন্যা বিক্রয়ের প্রথায়। যেখানে উচ্চবর্ণের সমাজে বরকে যৌতুক দিতে হতো, সেখানে নিম্নবর্ণের বা দরিদ্র সমাজে অনেক সময় বরের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে কন্যাদান করা হতো, যা 'শুল্ক' বা 'Bride Price' নামে পরিচিত। ধর্মশাস্ত্রকারগণ, বিশেষত মনু ও বশিষ্ঠ, এই প্রথাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। মনু বলেছেন, "যে পিতা কন্যার বিনিময়ে এক বিন্দু অর্থও গ্রহণ করেন, তিনি অপত্যবিক্রয়ী এবং নরকগামী হন" (Manusmriti, 3.51)। তা সত্ত্বেও, 'আসুর' বিবাহরীতি সমাজে প্রচলিত ছিল, যা প্রমাণ করে যে আইন ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরেও অর্থনৈতিক লেনদেন বিবাহের একটি বড় চালিকাশক্তি ছিল। তবে, কন্যা বিক্রয়ের এই প্রথা এবং যৌতুক প্রথা, উভয়ই নারীকে পণ্যায়ণের (Commodification) একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এক ক্ষেত্রে বরপক্ষ টাকা দিয়ে 'বউ কিনছে', অন্য ক্ষেত্রে কনেপক্ষ টাকা দিয়ে 'বর কিনছে'। উভয় প্রক্রিয়াতেই নারীর মানবিক সত্তা গৌণ এবং তাঁর বিনিময়মূল্য মুখ্য হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক লেনদেনের মাঝে নারীর নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ বা সম্মতির কোনো স্থান ছিল না।

বৈধব্যের প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি আরও করুণ ও জটিল আকার ধারণ করে। প্রাচীন হিন্দু আইনে বিধবার সম্পত্তির অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী, যৌথ পরিবারে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা সম্পত্তির মালিকানা পেতেন না, কেবল ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হতেন (Mulla, 2016, p. 238)। অন্যদিকে, দায়ভাগ আইনে (যা বাংলায় প্রচলিত ছিল) বিধবা স্বামীর অবর্তমানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন বটে, কিন্তু তা ছিল 'সীমিত স্বত্ব' বা 'Limited Estate' (Life Interest)। অর্থাৎ, তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন সম্পত্তির আয় ভোগ করতে পারবেন, কিন্তু আইনগত প্রয়োজন (Legal Necessity) ছাড়া সেই সম্পত্তি বিক্রি বা দান করতে পারবেন না (Menski, 2003, p. 165)। তাঁর মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি আবার স্বামীর বংশের পুরুষ উত্তরাধিকারীদের (Reversioners) কাছে ফিরে যেত। এই Life Interest-এর ধারণাটি মূলত সম্পত্তিকে নারীর হাত থেকে রক্ষা করে পুনরায় পুরুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এক আইনি কৌশল ছিল। জিমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মতো ভাষ্যকারগণ বিধবার অধিকার স্বীকার করেও তাঁকে এমন সব শর্তের জালে আবদ্ধ করেছিলেন যে, স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ভোগ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তার ওপর, বিধবার সতীত্ব বা চারিত্রিক পবিত্রতা ছিল এই অধিকার ভোগের পূর্বশর্ত। কোনো বিধবা যদি 'অসতী' বা ব্যভিচারী বলে প্রমাণিত হতেন, তবে তিনি তাঁর ভরণপোষণ ও

সম্পত্তির অধিকার, উভয়ই হারাতেন (Monsoor, 2008, p. 58)। অর্থাৎ, নারীর অর্থনৈতিক অধিকার তাঁর যৌন আচরণের ওপর নির্ভর করত, যা পুরুষের ক্ষেত্রে কখনোই প্রযোজ্য ছিল না।

৭. বিবাহবিচ্ছেদ, বৈধব্য ও অবিচ্ছেদ্যতার কঠোরতা

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থার আইনি ও সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে যে বিষয়টি নারীর অবস্থানকে সবচেয়ে করুণ ও অসহায় করে তুলেছিল, তা হলো দাম্পত্য সম্পর্কের 'অবিচ্ছেদ্যতা' বা 'Indissolubility of marriage'-এর মতো কঠোর শাস্ত্রীয় বিধান (Altekar, 1959, p. 84)। হিন্দু আইনতত্ত্বে বিবাহকে কোনো সাধারণ সামাজিক চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়নি; বরং একে জন্ম-জন্মান্তরের এক পবিত্র 'সংস্কার' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে (Mulla, 2013, p. 255)। এই তাত্ত্বিক পবিত্রতার আড়ালে এমন এক আইনি শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছিল, যা নারীর জন্য বিবাহবিচ্ছেদের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয় এবং বৈধব্যকে এক জীবন্ত মৃত্যুতে পরিণত করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ, বিশেষত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, দাম্পত্য সম্পর্ককে এমন এক ঐশ্বরিক বন্ধন হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যা স্বামী বা স্ত্রী, কারও পক্ষেই ছিন্ন করা সম্ভব নয় (Kane, 1941, p. 619)। মনুসংহিতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে: "ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে"।(মনুসংহিতা: ৯.৪৬), অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক বিক্রিত বা পরিত্যাক্ত হলেও স্ত্রী স্বামীর অধিকার থেকে মুক্ত হন না (Manu, 9.46; Olivelle, 2005, p. 196)। এই বিধানের আইনি তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী; এর অর্থ হলো, স্বামী যত বড় অপরাধী, নির্যাতনকারী বা দায়িত্বজ্ঞানহীনই হন না কেন, স্ত্রী তাঁর আইনগত ও ধর্মীয় বন্ধন থেকে কখনোই মুক্তি পাবেন না। এই 'অবিচ্ছেদ্যতা'র ধারণাটি মূলত নারীর যৌনতা ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের চিরস্থায়ী মালিকানা নিশ্চিত করার এক পিতৃতান্ত্রিক কৌশল ছিল, যা নারীর 'এক্সিট অপশন' বা সম্পর্ক থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

বিবাহবিচ্ছেদের প্রসঙ্গটি প্রাচীন ভারতীয় আইনের ইতিহাসে এক কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের মতো সেক্যুলার বা ব্যবহারিক আইনে বিবাহবিচ্ছেদের সুস্পষ্ট বিধান ছিল। কৌটিল্যের মতে, যদি স্বামী ও স্ত্রী (বিশেষত অপ্রশস্ত বিবাহে) পরস্পরকে ঘৃণা করেন (পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ), তবে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন (অর্থশাস্ত্র: ৩.৩.১৬)। তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা বা নিরুদ্দেশ স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহের সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন (অর্থশাস্ত্র: সংস্করণভেদে ৩.৪.২৪ – ৩.৪.২৯; Kangle, 1972, p. 242)। কিন্তু পরবর্তী ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শের পুনরুত্থানের ফলে এই উদারপন্থি বিধানগুলো বাতিল হয়ে যায়। স্মৃতিকারগণ বিধান দিলেন যে, বিবাহ যেহেতু কোনো চুক্তি নয়, তাই তা বাতিল করার কোনো এখতিয়ার মানুষের নেই। তবে এই নিয়মের প্রয়োগ ছিল চরমভাবে লিঙ্গবৈষম্যমূলক। কারণ, পুরুষের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ না থাকলেও 'স্ত্রী-পরিত্যাগ' ও

বহুবিবাহের সুযোগ ছিল (Menski, 2003, p. 58)। একজন পুরুষ চাইলেই 'বন্ধ্যা', 'অপ্রিয়বাদিনী' বা 'পুত্রহীন' স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারতেন, যা কার্যত ডিভোর্সেরই নামান্তর ছিল (Manu, 9.81)। কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রীর জন্য পুনর্বিবাহের কোনো সুযোগ ছিল না; তিনি আজীবন স্বামীর নাম ও গোত্র ধারণ করে সমাজচ্যুতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হতেন। অর্থাৎ, অবিচ্ছেদ্যতার এই কঠোরতা কেবল নারীর ক্ষেত্রেই একপাক্ষিকভাবে প্রযুক্ত হতো।

বৈধব্যের যন্ত্রণাও ছিল এই আইনি অবিচ্ছেদ্যতারই এক মর্মান্তিক ও যৌক্তিক পরিণতি। স্বামীই যদি নারীর একমাত্র গতি ও ইহলৌকিক-পারলৌকিক দেবতা হন, তবে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর অস্তিত্বের আর কোনো বৈধতা থাকে না, এই নিষ্ঠুর যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল বৈধব্যের কঠোর অনুশাসন (Altekar, 1959, p. 115)। প্রাচীন সমাজে, বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারে, বিধবার জীবন ছিল আক্ষরিক অর্থেই 'সামাজিক মৃত্যু'। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে বিধবার জন্য একাদশীর উপবাস, আমিষ বর্জন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান এবং সব ধরনের প্রসাধন ও আনন্দ-উৎসব থেকে বিরত থাকার কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছিল (Kane, 1941, p. 584)। এই কৃচ্ছ্রসাধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি: প্রথমত, বিধবার যৌনতাকে দমন করা, যাতে বংশের পবিত্রতা নষ্ট না হয়; এবং দ্বিতীয়ত, স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য তপস্যা করা। বিধবাকে 'অমঙ্গল' বা অশুভ মনে করা হতো এবং শুভ অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল। স্কন্দ পুরাণ ও পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে, যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বামীর সাথে স্বর্গে মিলিত হন (Parasara Smriti, 4.31–32)। অর্থাৎ, ইহকালের বঞ্চনাকে পরকালের লোভ দেখিয়ে বৈধতাদান করা হয়েছিল।

বৈধব্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল 'নিয়োগ' (Levirate) ও 'সতীদাহ' প্রথা। বৈদিক যুগে বংশরক্ষার প্রয়োজনে নিঃসন্তান বিধবাকে দেবর বা স্বামীর গোত্রীয় অন্য পুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হতো, যা 'নিয়োগ' প্রথা নামে পরিচিত (Rigveda, 10.40.2)। আপাতদৃষ্টিতে একে বিধবার অধিকার মনে হলেও, এটি ছিল মূলত মৃত স্বামীর বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য নারীর জরায়ুকে ব্যবহারের একটি উপযোগবাদী কৌশল (Utilitarian Strategy) (Bhattacharji, 1994, p. 145)। এখানে নারীর নিজস্ব যৌন আকাঙ্খা বা মাতৃত্বের কোনো স্থান ছিল না; এটি ছিল কেবল 'পুত্রার্থে' এক ধরনের যান্ত্রিক মিলন। তবে পরবর্তীকালে স্মৃতিকারগণ, বিশেষত মনু, এই প্রথাকে 'পশুধর্ম' বা অনার্য প্রথা বলে নিন্দা করেন এবং কলিযুগে এটি নিষিদ্ধ (কলিবর্জ্য) ঘোষণা করেন (Manu, 9.64–68)। নিয়োগ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিধবাদের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য অথবা স্বামীর চিতায় সহমরণ বা 'সতীদাহ'। যদিও ঋগ্বেদে সতীদাহের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে বিতর্ক আছে এবং অথর্ববেদে বিধবাকে চিতায় শোয়ার পর আবার উঠে আসার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তবুও

মধ্যযুগীয় ভাষ্যকাররা (যেমন রঘুনন্দন ও বিজ্ঞানেশ্বর) সতীদাহকে 'মহা পুণ্যকর্ম' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন (Kane, 1941, p. 627)। তাঁরা যুক্তি দেন যে, সতী নারী স্বামীর পাপরাশি ভস্মীভূত করে তাঁকে নরক থেকে উদ্ধার করেন। সতীদাহ ছিল পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের চূড়ান্ত রূপ, যেখানে নারীর শরীর ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সম্মান ও সতীত্বের গৌরব রক্ষা করা হতো।

বিধবা বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল হিন্দু সমাজকাঠামোর এক অনড় স্তম্ভ। পরাশর সংহিতায় যদিও একটি বিখ্যাত শ্লোকে (৪.২৮) বলা হয়েছে: "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ...", অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হলে নারীর পুনর্বিবাহ অনুমোদিত, কিন্তু পরবর্তী রক্ষণশীল সমাজপতিরা এই শ্লোকটিকে কলিযুগের জন্য অপ্রযোজ্য বা কেবল বাগদত্তা নারীদের জন্য প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন (Vidyasagar, 1855, p. 7; Parasara Smriti, 4.28)। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই শ্লোকের ভিত্তিতেই বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে উচ্চবর্ণের সমাজে বিধবা বিবাহ ছিল অকল্পনীয়। এর পেছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল প্রবল। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পত্তি পরিবারের ভেতরেই রাখা নিশ্চিত করা হতো। বিধবা যদি পুনর্বিবাহ করতেন, তবে তিনি মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার বা ভরণপোষণ হারাতেন। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা, উভয় আইনি ব্যবস্থাতেই বিধবার সম্পত্তির অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত (Life Interest), যা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যেত (Diwan, 2021, p. 305; Jimutavahana, Dayabhaga, 11.1.56)।

৮.পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ: প্রাচীন শিকড় ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের ঐতিহাসিক ও আইনি পর্যালোচনায় যে চিত্রটি উন্মোচিত হয়, তা কোনো সরলরৈখিক আখ্যান নয়; বরং তা ধর্ম, সমাজ ও পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতির এক জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট বয়ান (Chakravarti, 1993)। বৈদিক যুগের উষালগ্ন থেকে শুরু করে স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগের গোধূলি পর্যন্ত নারীর অবস্থানকে বিচার করলে দেখা যায়, সেখানে এক গভীর 'ডায়ালেক্টিক' বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই দ্বান্দ্বিকতা হলো তাত্ত্বিক মহিমাকীর্তন বনাম ব্যবহারিক শোষণের। শাস্ত্রীয় তত্ত্বে নারীকে 'অর্ধাঙ্গিনী', 'সহধর্মিনী' বা 'গৃহলক্ষ্মী' হিসেবে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হলেও, ব্যবহারিক আইনি কাঠামোয় তাঁকে ক্রমশ পুরুষের অধীনস্থ, বাকশক্তিহীন এবং সম্পত্তির অধিকারবঞ্চিত এক গৌণ সত্তায় পর্যবসিত করা হয়েছে (Altekar, 1959, p. 339)। এই গবেষণার নির্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর এই অধস্তনতা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং তা ছিল বর্ণপ্রথাভিত্তিক আর্য সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এক সুপরিকল্পিত কৌশল, যেখানে নারীর যৌনতা ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য ছিল (Chakravarti, 1993,

p. 581)। এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি, যাকে 'পবিত্র সংস্কার'-এর মোড়কে আবৃত করে নারীর 'এক্সিট অপশন' বা মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল (Menski, 2008, p. 62)।

বৈদিক যুগ থেকে স্মৃতির যুগে উত্তরণের পথে নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের যে প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা যায়, তাকে সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'পিতৃতান্ত্রিক দরকষাকষি' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে (Kandiyoti, 1988, p. 275)। বৈদিক ঋষিরা যেখানে যজ্ঞ ও সামাজিক উৎসবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে স্বাগত জানাতেন, পরবর্তী স্মৃতিকাররা, বিশেষত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, সেখানে নারীর পরিসরকে কেবল অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ করে দেন (Bhattacharji, 1990)। এই পরিবর্তনের মূল কারণ নিহিত ছিল আর্য সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদে। অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ রোধ এবং বর্ণের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নারীর 'সতীত্ব' হয়ে ওঠে সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর এই সম্পদ রক্ষার দায়ভার চাপানো হয় নারীর ওপর, বাল্যবিবাহ ও কঠোর পর্দা প্রথার মাধ্যমে (Altekar, 1959, p. 353)। মনুর সেই বিখ্যাত বিধান– "পিতা রক্ষতি কৌমারে ... ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" - কেবল একটি শ্লোক নয়; এটি ছিল নারীর আইনি অক্ষমতার ঘোষণাপত্র (Manusmriti, 9.3; Olivelle, 2005, p. 190)। এর মাধ্যমে নারীকে আজীবন অভিভাবকত্বের অধীন করা হলো, যা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বা 'এজেন্সি'কে নস্যাৎ করে দিল। বিবাহ আর দুটি মানুষের মিলন রইল না; তা হয়ে দাঁড়াল দুটি পরিবারের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন, যেখানে নারী হলেন বিনিময়যোগ্য উপহার বা পণ্য (Kane, 1941, p. 531)।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং বেদনাদায়ক দিকটি হলো আধুনিক বাংলাদেশে এর আইনি ও সামাজিক অভিঘাত। প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রগুলো কেবল ইতিহাসের পাতায় বা জাদুঘরে সংরক্ষিত কোনো বিষয় নয়; বরং বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এই হাজার বছরের পুরনো স্মৃতি-ভাষ্যগুলোই আজও 'জীবন্ত আইন' হিসেবে কার্যকর (Huda, 2011, p. 67)। যেখানে ভারত ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন সংস্কারের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ এবং নারীদের সম-উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে, সেখানে বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইন আজও মূলত প্রাক-ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ আমলের বিচারিক ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার মূল ভিত্তি হলো সেই প্রাচীন দায়ভাগ মতবাদ (Monsoor, 2008, p. 145)। ফলে, এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও বাংলাদেশের একজন হিন্দু নারী আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রাচীন শাস্ত্রে বিবাহকে যে 'অবিচ্ছেদ্য' বা জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন বলা হয়েছিল, আধুনিক মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সংবিধানের যুগেও সেই ধারণাটি বাংলাদেশে হিন্দু আইনের মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে (Halder, 2015, p. 88)। স্বামী যদি নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী, লম্পট বা উন্মাদও হন, তবুও হিন্দু স্ত্রী তাঁকে আইনগতভাবে

ডিভোর্স দিতে পারেন না; বড়জোর ‘পৃথক বসবাস’ বা ‘জুডিশিয়াল সেপারেশন’ চাইতে পারেন, যা তাঁকে বৈবাহিক বন্ধন থেকে মুক্তি বা পুনর্বিবাহের সুযোগ দেয় না (Huda, 2011, p. 72)। এটি নারীর মানবাধিকারের এক চরম লঙ্ঘন, যার শিকড় প্রোথিত আছে সেই হাজার বছরের পুরনো ‘পতিব্রতা’ ধর্মের ধারণায়।

অর্থনৈতিক বঞ্চনার ক্ষেত্রটিও প্রাচীন আইনের এক দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার। প্রাচীন শাস্ত্রে নারীকে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে যে ‘স্ত্রীধন’-এর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল, আধুনিক বাংলাদেশেও তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি (Mulla, 2016, p. 110)। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশে হিন্দু নারীরা সাধারণত স্বামীর সম্পত্তিতে ‘জীবনস্বত্ব’ পান, কিন্তু পূর্ণ মালিকানা পান না। অর্থাৎ, তিনি সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন, কিন্তু 'আইনগত প্রয়োজন' ছাড়া তা বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবেন না (Diwan, 2008, p. 345)। তাঁর মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি স্বামীর পুরুষ উত্তরাধিকারীদের (Reversioners) কাছে ফিরে যায়। এই আইনি ব্যবস্থা নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের ওপর আজীবন নির্ভরশীল করে রাখে (Agnes, 2001, p. 42)। সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার না থাকায় নারী চাইলেও স্বাবলম্বী হতে পারেন না বা নির্যাতনমূলক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। প্রাচীন ঋষিরা যে যুক্তিতে নারীকে পিণ্ডদানে অক্ষম বলে সম্পত্তিতে অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন, আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে সেই ধর্মীয় যুক্তি টিকিয়ে রাখা নারীর সাংবিধানিক সমতার পরিপন্থি (Huda, 2011, p. 125)। অথচ, ধর্মীয় অনুভূতি ও শাস্ত্রীয় বিধানের দোহাই দিয়ে এই বৈষম্যমূলক আইনগুলোকেই রক্ষা করা হচ্ছে।

সামাজিক মনস্তত্ত্বে প্রাচীন আদর্শের প্রভাবও সমানভাবে গভীর। সীতা-সাবিত্রীর যে মিথলজিক্যাল আদর্শ নারীকে শেখানো হয়, তা তাঁকে সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হতে শেখায় (Kakar, 1988, p. 17)। গার্হস্থ্য হিংসা বা বঞ্চনাকে ‘ভাগ্য’ বা ‘পূর্বকর্মফল’ হিসেবে মেনে নেওয়ার যে মানসিকতা, তা মূলত এই প্রাচীন শাস্ত্রগুলো দ্বারাই নির্মিত। বহুবিবাহের বিষয়টিও এখানে প্রাসঙ্গিক। যদিও আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বহুবিবাহ কমে এসেছে, তবুও প্রাচীন আইনে পুরুষের বহুবিবাহের ‘তাত্ত্বিক অনুমতি’ আজও রয়ে গেছে (Monsoor, 2008, p. 160)। অন্যদিকে, নারীর সতীত্ব ও একগামিতার ওপর যে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছিল, তা আজও সামাজিক সম্মানের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিধবা বিবাহের আইনি বৈধতা (১৮৫৬ সালের আইন) থাকলেও সামাজিকভাবে তা আজও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে খুব একটা সমাদৃত নয় (The Hindu Widows’ Remarriage Act, 1856)। সাদা শাড়ি, নিরামিষ আহার এবং সব ধরনের আনন্দ-উৎসব থেকে বিধবার নির্বাসন– এই দৃশ্যপটগুলো প্রমাণ করে যে, প্রাচীন স্মৃতির অনুশাসন আধুনিক আইনি সংস্কারের চেয়েও শক্তিশালী।

তদুপরি, বিবাহপূর্ব নির্বাচন ও সম্মতির প্রশ্নেও প্রাচীন মানসিকতা প্রবলভাবে সক্রিয়। আধুনিক বাংলাদেশে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও, বিবাহের ক্ষেত্রে 'পারিবারিক সম্মতি' ও 'গোত্র বিচার' আজও প্রধান নিয়ামক। প্রেম বা নিজস্ব পছন্দে বিবাহকে আজও অনেক ক্ষেত্রে 'সামাজিক বিচ্যুতি' হিসেবে দেখা হয়, যা সেই প্রাচীন 'গান্ধর্ব' বিবাহকে নিরুৎসাহিত করার মনস্তত্ত্বেরই আধুনিক সংস্করণ। বাঙালি হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও বহু প্রান্তিক মানুষ সেই প্রাচীন 'গৌরীদান' প্রথার গৌরব এখনও ভোলেনি। যদিও রাষ্ট্রীয় আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু গ্রামীণ জনপদে ধর্মীয় পুণ্যের আশায় বা সামাজিক নিরাপত্তার অজুহাতে আজও কন্যাশিশুকে বিবাহের পিঁড়িতে বসানো বিরল নয় (UNICEF, 2020)।

৯. উপসংহার

প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের ঐতিহাসিক ও আইনি বিশ্লেষণান্তে যে সত্যটি প্রতিভাত হয়, তা হলো, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নারীর সামাজিক ও আইনি মর্যাদা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে এবং পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের সুকঠিন শৃঙ্খলে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন (Altekar, 1959, p. 338)। এই গবেষণার সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে নারীর যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও 'অর্ধাঙ্গিনী'র মর্যাদা ছিল, স্মৃতি ও পৌরাণিক যুগে এসে তা নাটকীয়ভাবে লোপ পায়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই মূলত নারীর এই অধস্তনতার আইনি ও সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণ করা হয়েছে (Chakravarti, 1993, p. 579)। শাস্ত্রীয় তত্ত্বে বিবাহকে 'পবিত্র সংস্কার' বা জন্মান্তরের বন্ধন হিসেবে মহিমান্বিত করা হলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা ছিল নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ ও তাঁর প্রজনন ক্ষমতার ওপর পুরুষের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এক মোক্ষম হাতিয়ার (Menski, 2003, p. 112)। আধুনিক নারীবাদী বিশ্লেষকদের অনেকে দাবি করেন যে 'কন্যাদান' প্রথার মাধ্যমে নারীকে 'ব্যক্তি' থেকে 'সম্পত্তি' বা দানসামগ্রীতে রূপান্তর এবং 'পাণিগ্রহণ' ও 'সপ্তপদী'র আচারের মাধ্যমে পুরুষের প্রতি তাঁর চিরস্থায়ী আনুগত্যের সূচনা হয়।

এই গবেষণায় উন্মোচিত হয়েছে যে, প্রাচীন হিন্দু আইনপ্রণেতারা নারীর জীবনকে কেবল 'স্ত্রী' ও 'জননী', এই দুটি ভূমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন (Doniger, 2010, p. 350)। বাল্যবিবাহের প্রবর্তন, পতি নির্বাচনের অধিকার হরণ এবং কঠোর বৈধব্য পালনের বিধান, এ সবই ছিল নারীর যৌনতা ও সতীত্ব রক্ষার নামে পুরুষের বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার কৌশল (Altekar, 1959, p. 56)। অর্থনৈতিকভাবে নারীকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং নামমাত্র 'স্ত্রীধন'-এর সান্ত্বনা দিয়ে তাকে আজীবন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল (Agnes, 1999, p. 62)। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতাই নারীকে পারিবারিক নির্যাতন, বহুবিবাহের অসম প্রতিযোগিতা এবং

স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য করেছে। মনুসংহিতার সেই অমোঘ বিধান 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' কেবল একটি আইনি নির্দেশ ছিল না; এটি ছিল নারীর মনস্তত্ত্বে পরাধীনতাকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য হিসেবে গেঁথে দেওয়ার এক সফল মতাদর্শিক প্রয়াস (Manu Smriti, 9.3)।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, প্রাচীন ভারতের এই ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানগুলো কেবল ইতিহাসের মৃত দলিল নয়; বরং আধুনিক বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনের বর্তমান অচলায়তনের মূল শিকড় এখানেই প্রোথিত (Huda, 2011, p. 89)। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা বিবাহবিচ্ছেদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, কিংবা পিতার সম্পত্তিতে সম-অধিকার পান না, তখন বুঝতে হয় যে প্রাচীন ঋষিদের সেই পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন আজও 'জীবন্ত আইন' হিসেবে নারীর মানবাধিকারকে খর্ব করে চলেছে (Monsoor, 2008, p. 204)। রাষ্ট্র ও সমাজ যেখানে আধুনিকতার পথে হাঁটছে, সেখানে হিন্দু নারীর ব্যক্তিগত আইন বা 'পার্সোনাল ল' আজও হাজার বছরের পুরনো বৈষম্যমূলক প্রথা ও সংস্কারের বেড়াজালে বন্দি। 'ধর্মীয় পবিত্রতা'র দোহাই দিয়ে এই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা মূলত নারীর সমমর্যাদা ও সাংবিধানিক সমানাধিকারের পরিপন্থি ।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা নারীর জন্য যে 'সুরক্ষা'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মূল্য হিসেবে কেড়ে নিয়েছিল তাঁর 'মুক্তি' ও 'মানবিক সত্তা'। আজকের দিনে প্রয়োজন সেই প্রাচীন ইতিহাসের নির্মোহ পাঠ এবং তার সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন। কেবল অতীতের গৌরবগান নয়, বরং অতীতের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করাও সমাজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ (Thapar, 2000, p. 15)। নারীর অবস্থানকে কেবল শাস্ত্রের পাতায় বা দেবীর মূর্তিতে নয়, বরং বাস্তব জীবনের কঠোর মাটিতে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই হোক আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গীকার। সমৃদ্ধ অতীতের জন্য আমরা গর্বিত, কিন্তু প্রাচীন শিকড়ের বন্ধন যেন নারীর আগামীর পথচলায় শৃঙ্খল না হয়ে ওঠে, এটাই এই গবেষণার চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যাশা।

সহায়কপঞ্জি

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.] (২০১১)। *মনুসংহিতা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

যোগীরাজ বসু (১৯৫৭)। *বেদের পরিচয়: বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত [অনুবাদ/সম্পা.] (১৮৮৫)। *ঋগ্বেদ সংহিতা* (খণ্ড ১)। কলকাতা।

রাধাগোবিন্দ বসাক [অনুবাদ/সম্পা.] (১৯৬৪)। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*। কলকাতা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [অনুবাদ/সম্পা.] (২০১৫)। *মনুসংহিতা*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Agnes, F. (1999). *Law and gender inequality: The politics of women's rights in India*. Oxford University Press.

Altekar, A. S. (1959). *The position of women in Hindu civilization: From prehistoric times to the present day* (2nd ed.). Motilal Banarsidass.

Bader, C. (2013). *Women in ancient India: Moral and literary studies* (Reprint; original work published 1867). Routledge.

Bhattacharji, S. (1990). Motherhood in ancient India. *Economic and Political Weekly, 25*(42/43), WS50–WS57.

Bhattacharji, S. (1994). *Women and society in ancient India*. Basumati Corporation.

Bhattacharya, N. N. (2005). *Ancient Indian rituals and their social contents*. Manohar Publishers.

Chakravarti, U. (1993). Conceptualising Brahmanical patriarchy in early India: Gender, caste, class and state. *Economic and Political Weekly, 28*(14), 579–585.

Diwan, P. (2008). *Modern Hindu law* (19th ed.). Allahabad Law Agency.

Diwan, P. (2013). *Modern Hindu law* (22nd ed.). Allahabad Law Agency.

Diwan, P. (2018). *Modern Hindu law* (23rd ed., reprint). Allahabad Law Agency.

Diwan, P. (2020). *Modern Hindu law* (24th ed.). Allahabad Law Agency.

Diwan, P. (2021). *Modern Hindu law* (25th ed.). Allahabad Law Agency.

Doniger, W. (2010). *The Hindus: An alternative history*. Oxford University Press

Doniger, W., & Kakar, S. (2002). *Kamasutra*. Oxford University Press

Griffith, R. T. H. (Trans.). (1896). *The Hymns of the Rigveda*. E. J. Lazarus & Co.

Haug, M. (Trans.). (1863). *The Aitareya Brāhmaṇa of the Rigveda* (Vol. 2). Government Central Book Depot.

Huda, S. (2011). *Combating gender injustice: Hindu law in Bangladesh*. South Asian Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies (SAILS)

Joshi, K. L. (Ed.). (2005/2006). *Yajnavalkya Smriti: Sanskrit Text with English Translation*. Delhi: Parimal Publications (Parimal Sanskrit Series, No. 87).

Kakar, S. (1988). Feminine identity in India. In R. Ghadially (Ed.), *Women in Indian society: A reader* (pp. 44–68). Sage Publications.

Kandiyoti, D. (1988). Bargaining with patriarchy. *Gender & Society, 2*(3), 274–290.

Kane, P. V. (1941). *History of Dharmaśāstra: Ancient and mediaeval religious and civil law in India* (Vol. II, Pt. I). Bhandarkar Oriental Research Institute.

Kane, P. V. (1974). *History of Dharmaśāstra: Ancient and mediaeval religious and civil law in India* (Vol. II, Pt. I) [Reprint]. Bhandarkar Oriental Research Institute. (Original work published 1941).

Kangle, R. P. (Trans.). (1972). *The Kautilīya Arthaśāstra*: *Sanskrit text with a glossary* (Part II, 2nd ed.). University of Bombay.

Kapadia, K. M. (1966). *Marriage and family in India* (3rd ed.). Oxford University Press.

Keith, A. B. (Trans.). (1914). *The Veda of the Black Yajus school: Entitled Taittiriya Saṃhitā*. Harvard University Press.

Leslie, J. (1989). *The perfect wife: The orthodox Hindu woman according to the Strīdharmapaddhati of Tryambakayajvan*. Oxford University Press.

Macdonell, A. A., & Keith, A. B. (1912). *Vedic index of names and subjects* (Vol. 1). John Murray.

Manu. (1886). *The Laws of Manu* (G. Bühler, Trans.; *Sacred Books of the East*, Vol. 25). Oxford University Press.

Manu. (1991). *The Laws of Manu* (W. Doniger & B. K. Smith, Trans.). Penguin Classics.

Manu. (2005). *Manu's Code of Law: A critical edition and translation of the Mānava-Dharmaśāstra* (P. Olivelle, Ed. & Trans.). Oxford University Press.

Menski, W. (2003). *Hindu law: Beyond tradition and modernity*. Oxford University Press.

Meyer, J. J. (1930). *Sexual life in ancient India: A study in the comparative history of Indian culture*. George Routledge & Sons.

Monsoor, T. (2008). *Gender equity and economic empowerment: Family law and women in Bangladesh*. British Council.

Mulla, D. F. (2016). *Mulla: Principles of Hindu law* (22nd ed., S. A. Desai, Ed.). LexisNexis.

Paraskara Gṛhya-sūtra, Adhyāya I, Kaṇḍikā 8 (English transl. in Hermann Oldenberg, *The Grihya-Sutras*, SBE, 1886).

Rigveda. (2014). *The Rigveda: The earliest religious poetry of India* (S. W. Jamison & J. P. Brereton, Trans.). Oxford University Press.

Satapatha Brāhmaṇa. (1900). *The Satapatha Brāhmaṇa* (J. Eggeling, Trans.; *Sacred Books of the East*, Vol. 12). Clarendon Press.

Sharma, R. S. (1983). *Material culture and social formations in ancient India*. Macmillan India.

Thapar, R. (2000). *History and beyond*. Oxford University Press.

UNICEF. (2020). *Ending child marriage: A profile of progress in Bangladesh*. UNICEF Bangladesh.

Upadhyay, B. S. (1974). *Women in Rigveda*. S. Chand & Co.

Vyāsa, K. D. (Krishna-Dwaipayāna Vyāsa). (2003). *The Mahābhārata of Krishna-Dwaipayāna Vyāsa: Adi Parva* (K. M. Ganguli, Trans.). Munshiram Manoharlal Publishers. (Translation originally published 1883–1896.)

Westermarck, E. (1921). *The history of human marriage* (Vol. 1). Macmillan and Co.

Wilson, H. H. (Trans.). (1840). *The Vishnu Purana: A system of Hindu mythology and tradition*. John Murray.